হ্যারিয়েট মনরো ও বুদ্ধদেব বসু ঃ শিকাগোর পোয়েট্রি ও কবিত াভবনের কবিতা

সালাহউদ্দীন আইয়ুব

বহুদিন আগে চট্টগ্রামের এক পুরানো বইয়ের দোকানে অকস্মাৎ আবিষ্কার করি দেশ পত্রিকার ১৯৭৪-সালের এক সা হিত্যসংখ্যা যার মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর 'আমাদের কবিতাভবন' লেখাটি দেখে শিহরিত হই। অতিরিক্ত কম যত্ন করে রেখেছিল াম বলে কিনা জানিনা, আমার বইয়ের স্তূপ থেকে সংখ্যাটি একদিন হারিয়ে যায়। তারপর অনেক খুঁজেও ওই বিশেষসংখ্য া বা বুদ্ধদেব বসুর ওই লেখাটি আর পাইনি। ১৯৯৭-সাল নাগাদ প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর রচনাবলীর সব খণ্ড আমি কিনি ও এক ঘোরের ভেতর পড়ে শেষ করি ; আমাদের গ্রামের বাড়িতে অফুরন্ত অবকাশের ভেতর তাঁর অনেক উপন্যাস ও গল্পের বই পড়ে ফেলার কথা মনে পড়ে। বুদ্ধদেব বসু ছাড়া আর কোনো বাঙালি লেখকের লেখা এমন নিষ্ঠা নিয়ে, এমন ধ ারাবাহিকভাবে, পড়েছি বলে মনে হয় না ; কিন্তু কেবল ওই রচনাটি কোথায়ও অন্তর্ভূত হতে দেখি না। আজ এতদিন পরে এত দূরে বসে পেয়ে গেলাম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত সে লেখা (আমাদের কবিতাভবন, বুদ্ধদেব বসু ঃ সূত্র ও সংযোজন দময়ন্তী বসু সিং, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০১)—যা কবি পরিবারের উদ্যোগে তাঁর তিরানববইতম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকা শিত।

ঢাকাতে প্রথম পোয়েট্রি কাগজটি দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুদ্ধদেবের কবিতা পত্রিকার কথা মনে পড়েছিল। ভেবেছিলাম শিকাগোর পোয়েট্রি-কে মডেল করেই হয়ত বা বুদ্ধদেবের কবিতা পত্রিকার যাত্রা শুধু। ভুল ভাঙিয়ে দিলেন বুদ্ধদেব নিজেই ঃ

পরিচয়ের কোনো-এক বৈঠকে দেখেছিলাম অন্নদাশঙ্করের হাতে একটি ইংরেজি পত্রিকা— চেহারা কিছুটা শেষ উনিশ-শতকী, ইঁট-রঙের মলাট থেকে বিসারিত চোখে তাকিয়ে আছেন শেলি, লম্বা রোগা অক্ষরে আঁকা 'পোইট্রি' তার শিরোন ামা। আমি জানিনা সেটাই হ্যারিয়েট মনরো-স্থপিত শিকাগোর 'পোইট্রি' কিনা— তখনও সেই বিখ্যাত পত্রিকাটির নাম শুনিনি। কিন্তু সেটাতেও ছিল শুধু কবিতা আর হয়তো কিঞ্চিৎ কবিতা-সংক্রান্ত গদ্য। নমুনাটি উল্টে-পাল্টে দেখে আমার মনের মধ্যে একটা উশকানি জাগলো। এরকম একটি কবিতাসর্বস্ব পত্রিকা বাংলায় কি বের করা যায়না?

আমাদের কবিতাভবন, পৃ. ১০

হয়তো পোয়েট্রি-ই ছিল ওই কাগজ ; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিদেশি মডেলের অনুকরণে নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার নিয়তিই সম্ভবপর করে তোলে কবিতা-র জন্ম আর বুদ্ধদেবের আধুনিক মনন ও চি নির্ধারণ করে তার চরিত্র। অন্নদ াশংকরের হাতে যে কাগজই তিনি দেখুননা কেন, কেবল অই একটি উল্লেখ দিয়ে কবিতা পত্রিকার উদ্ভব-বিকাশের বৃত্তান্ত বোঝা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, কবিতা বুদ্ধদেবের এক হাতে গড়া সৃষ্টি ; এটি বুদ্ধদেবের একক একাগ্র উদ্যমের ফল। শিকাগোর পোয়েট্রি-র প্রধান উদ্যোক্তা যদিও হ্যারিয়েট মনরো, কাগজটির প্রকাশ, পরিকল্পনা ও উত্তরকালের নানারকম বিবর্তনে অংশ নেন বহুধরনের ব্যক্তি। এর ফলে এক দশকের পোয়েট্রি-র সঙ্গে অন্যদশকের পোয়েট্রি-র বিরাট তফাত লক্ষ করা যায়। কবিতা পত্রিকার মধ্যে যেমন একটা বিশেষ ধরনের চরিত্রের উদ্ভাসন গোড়া থেকে মুদ্রিত ও আনুপূর্ব অবিচলিত দেখি, পোয়েট্রি-তে সেটা আমরা পাবনা। হ্যারিয়েট মনরো যদিও কবি, কর্মোদ্যোগী ও আধুনিক কবিতার প্রতিশ্রুত সুযে

াগ্য সম্পাদক ছিলেন, বুদ্ধদেবের বহুমুখী বিরাট প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে তার তুলনা সংগত ঠেকে না। বুদ্ধদেবের সঙ্গে হ্যারিয়েটের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বিরাট পার্থক্য সত্ত্বেও পোয়েট্রি ও কবিতা পত্রিকার মধ্যে মিল তবু বিস্তর— সেই মিলের কারণ আধুনিকমনস্ক সাহিত্যপ্রবণতা এবং একটা বিশেষধরনের সাহিত্যরুচি। আধুনিক কবিতার উত্থানের ইতিহাস ও এ-দুটো পত্রিকার বিকাশের বৃত্তান্ত বহুদিক থেকে প্রায় অভিন্ন বলে দুটো পত্রিকার তুলনা জরি। তবে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান থেকেও আমরা বুঝি যে ইংরেজি আধুনিক কবিতার বিকাশে কেবল পোয়েট্রি-র একার নয়, আরো বহু কাগজের ভূমিকা রয়েছে ; কিন্তু বাংলায়? আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কি তা বলা সম্ভব?

১৯১২ সালে যে পোয়েট্রি-র অভ্যুদয়, প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি সময় পার করে দিয়েও তার প্রকাশ অব্যাহত আছে দেখে অবাক হই। এত দীর্ঘদিন ধরে একটা পত্রিকার একটানা প্রকাশ পশ্চিমেও বিরল ঘটনা। ফ্রাঙ্ক লুথার মট পোয়েট্রি সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, বুদ্ধদেবের কবিতা পত্রিকা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য ঃ পোয়েট্রি কাগজ তুলে ধরে একটা দীর্ঘ সময়ে পরিব্যাপ্ত মার্কিন কবিতার ইতিহাস ; এ কাগজ আবিষ্কার করে আমেরিকার অনেক প্রধান ও প্রতিভাবান কবিকে যাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো সময়ে এ কাগজে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।[Frank Luther Mott, “Poetry”, A History of American Magazines, 5 vols. (Cambridge, Mass : Belknap Press of Harvard University Press, 1968), 5 : 244]. পোয়েট্রির আবির্ভাব মুহূর্তে যেসব কাগজে কবিতা বেত তা হল আটলান্টিক, হার্পার্স ও স্পাইবনার্স—কিন্তু সেসব কবিতা ছিল, হ্যারিয়েট মনরো-র ভাষায়, একেবারেই মলিন, অনুজ্জ্বল ও প্রথাগত। হ্যারিয়েট ব্যথিত ও পীড়িত বোধ করেন সাহিত্যের এ পরিস্থিতিতে, কেননা তিনি ভাল করেই জানতেন যাঁদের কবিতা কাগজে ছাপা হয় কেবল তাঁরাই আমেরিকার কবি নন ; তার বাইরেও অনেক নতুন কণ্ঠস্বর এই বিশাল দেশের বহুস্থানে ছড়িয়ে আছে, যথাযথ আউটলেটের অভাবে যাঁদের আত্মপ্রকাশ হয় বিঘ্নিত অথবা বাধাগ্রস্ত। এ পোয়েটস লাইফ (১৯৩৮) নামক আত্মজীবনীতে হ্যারিয়েট আত্মপ্রকাশের জন্যে নতুন কবিদের সেকালে কী রকম সংগ্রাম করতে হত তার বিবরণ দেন। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এই সংগ্রামের কথাটা অবশ্য আরো অনেক বেশি করে সত্য। আমাদের সৌভাগ্য এই যে আধুনিক কবিতার পক্ষে সেই সংগ্রামের দায়িত্ব অসামান্যরকম উদার, মহৎ ও মেধাবী বুদ্ধদেব স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন। শুধু কি আধুনিক কবিতার জন্যে? আধুনিক কবিদের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি যে লড়াই করেন তার তুলনা কোথায়? মনে রাখতে হবে যে এসব লড়াইয়ের কারণে বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক ইমেজ অনেকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমাদের কবিতাভবন-এ আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন মুখার্জীর সম্পাদনায় আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনে বুদ্ধদেব-নির্বাচিত জীবনানন্দের কবিতাগুলোর অন্তর্ভুক্তি নিয়ে যে তুমুল বিতর্ক হয় তার বিবরণ আছে। কবির যেসব কবিতা বাছাই করে বুদ্ধদেব ওই সংকলনে দিতে চেয়েছিলেন, বিদগ্ধ সম্পাদকদ্বয় তো বটেই ওঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য উপদেশকেরাও তাতে রাজি হননি। জীবনানন্দের জন্যে শেষমেষ বরাদ্দ হয় অল্প একটু জায়গা। দীর্ঘ পনের বছর কেটে যাবার পর এ-সংকলন প্রকাশের দায়িত্ব যখন বুদ্ধদেবের ওপর এককভাবে বর্তায়, জীবনানন্দকে ‘তাঁর যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত’ করে তবেই তাঁর ‘রসবোধ ও বিবেক’ তৃপ্ত হয়। যিনি ছিলেন তিরিশের কবিতার প্রধানতম আধুনিকদের অন্যতম, সেই সুধীন্দ্রনাথ দত্তও যে জীবনানন্দের কবিতার অভিনবত্ব ধরতে পারেননি সে কথা ভুলে গেলে আধুনিক বাংলা কবিতার রাজনীতি আমরা ধরতে পারব না। আমি ‘রাজনীতি’ কথাটা সমকালীন সমালোচনাতাত্ত্বিক অর্থে ব্যবহার করছি, কোনো দল বা মতবাদের অর্থে নয়। আমরা জানি, বুদ্ধদেবের উল্লিখিত রচনায় তো বটেই আমার যৌবন সহ আরো নানাস্থানে—এমনকী তাঁর সৃষ্টিশীল অনেক গল্প-উপন্যাসে— বুদ্ধদেব বসু একটা বিশেষ ধরনের সাহিত্যাদর্শ প্রস্তাব, সমর্থন ও দৃঢ়ভাবে উত্থাপন করেন। অন্য যে কোনো লেখকের মতো রোমান্টিক ছিলেন বটে, শিল্পের জন্যে শিল্প মতবাদেও পক্ষপাত ছিল তাঁর, কিন্তু এ ধরনের অধ্যাপকীয় মন্তব্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যের আগামাথা কিছুই আন্দাজ করা সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব বসু স্থিরভাবে বিশ্বাস করতেন যে কোনোরকম হিতবাদ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিলাষ থেকে মহৎ সাহিত্যের জন্ম হয় না ; সমাজ পরিবর্তনের প্রতিজ্ঞা থেকে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস বিরল না হলেও তার মাধ্যমে সমাজপরিবর্তন ঘটে বা ঘটেছে এমন মীমাংসায় উপনীত হওয়া নেহাত ছেলেমানুষী। সাহিত্য স্বমূল্যে গরীয়ান অসামান্য মানবিক উদ্যমের ফল। পৃথিবী বা সমাজের উপকারসাধন সৃজনকর্মের আবশ্যক শর্ত তো নয়ই, কখনো কখনো সৃজনপ্রয়াসের একমাত্র অন্তরায়ও হতে পারে। তবু প্রয়োজন বা পরিণামের প্রশ্ন যদি ওঠেই, বুদ্ধদেব হয়তো বলবেন, সাহিত্য দিয়ে জগতের পরিবর্তন এর দূরতম লক্ষ্য না

হলেও মনোজাগতিক পরিবর্তনের সহায়ক শক্তি হিসেবে সাহিত্যের ক্ষমতা পরীক্ষিত। শীলিত, উন্নত ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত মন যদি আধুনিক সমাজের অভিপ্রেত হয় এবং কাম্য হয় চিন্তাশীলতায় অভ্যস্ত, বিকশিত, বহুরকম নারীপুষ, সাহিত্য বাদ দিয়ে তার উদ্ভাবন বুদ্ধদেব বসু সম্ভবপর মনে করেননি। আমাদের কবিতাভবন-এ ঠিক এ কথাগুলো তিনি বলেননি, কিন্তু বুদ্ধদেবের বিদ্ধে সমাজবাদীদের অভিযোগগুলো ঠিক কী ছিল তা তাঁর এ লেখা থেকে জানা যায়। অবান্তর ভেবে ওসবের উত্তর তিনি দেননি অবশ্য, কেননা তাঁর বিপুল ও বিস্ময়কর সাহিত্যকর্মই তো তার যথার্থ জবাব। উত্তর না দিলেও, অভিযোগগুচ্ছের উত্থাপন ও বিবরণে বুদ্ধদেবকে একটা বিশেষ ধরনের আয়রনির আশ্রয় নিতে দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসু রাতারাতি সমাজ বদলানোর উৎসাহকে ছেলেমানুষির বেশি কিছু ভাবতে পারেননি। বুদ্ধদেবের নির্বিকার অথচ দৃঢ়, নিরাসক্ত অথচ স্থির, রোমান্টিক কিন্তু জটিল সাহিত্যবোধকে যাঁরা সমাজবিরোধী ও পলায়নী প্রতিন্যাস ভেবে নিজেদের তোষামোদে লিপ্ত হন, তাঁদের জন্যেই বরং আজ আমাদের কথা হয়। সমাজপরিবর্তনকে বুদ্ধদেব বসু যদি কতিপয় ব্যক্তির যূথবদ্ধ সদিচ্ছার যোগফল না ভেবে থাকেন, তাহলে মানতেই হবে তাঁর সমাজবোধ অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর ও পরিণত ছিল। ডুর্খেইম থেকে গিডেনস পর্যন্ত মূলধারার সমাজতত্ত্বে সমাজ বিষয়ে একটা প্রধান ধারণা আমরা এইভাবে ব্যক্ত হতে দেখি যে, সমাজ কতিপয় ব্যক্তির সচেতন প্রতিজ্ঞা বা কর্মকাণ্ডের ফল নয়, প্রজেক্ট নয়, প্রোগ্রাম নয়, বরং এক বিস্ময়কর, অবচেতনে-নিহিত সমবায়ী বাস্তবতা, এক অবাক করা ছন্দোময় সমগ্র যার কোনো কোনো অংশ, দিক, প্রান্তে সমাজশাস্ত্রীরা আলো ফেলতে সক্ষম হলেও সমাজ নামক এই প্রায় অন্তর্বৃত বিরাট মেশিনের সপ্রাণ সক্রিয়তার সমস্ত রহস্যের উদঘাটন সম্ভবপর হয়নি ; তার প্রয়োজনও নেই। সমাজব্যাপারের এই গভীরতর সত্যের অনুধাবক বুদ্ধদেব বসুকে তাই সমাজবদলের প্রচারমূলক ফর্মুলা দিয়ে অভিভূত করা সম্ভবপর ছিল না। তবুও ধৈর্য ধরে ভদ্রতাবশত এবং অনেকসময়েই যথেষ্ট যন্ত্রণা নিয়ে সমাজবাদীদের ধর্মতুল্য আপ্তবাক্য তাঁকে শুনতে হয়েছে ঃ

কবিতাভবনের সান্ধ্য আড্ডায় আমাকে শুনতে হয় অনেক তর্ক যাতে আমার মন নিঃসাড় হয়ে থাকে, সহ্য করতে হয় অনেক নিষ্ফল অশান্তি, মুখে একটি কুস্বাদ নিয়ে শুতে যাই কোনো কোনো রাত্রে। কেউ কেউ আসেন ঝুড়ি-ভর্তি খবর নিয়ে যা না জানলেও আমার দিব্যি চলে যেতো ; কোনো হিতৈষী আমাকে এক ঘণ্টা ধরে শিক্ষা দেন কোনো তৎকালিক বিষয়ে যাতে আমার এককোঁটা উৎসাহ নেই। আমি পাই না সেই বাতাসের ছোঁওয়া যাতে অস্পষ্ট রেণু উড়ে বেড়ায়, সেই অর্ধালোক যেখানে কল্পনা খেলা করতে পারে—সব যেন আঁটো, উগ্র, অত্যন্ত বেশি নিশ্চিত। যেন জুটে গেছে হাতের মুঠোয় কোনো আলাদীনের দীপ ; কোনো অব্যর্থ ঝিন্তর মাদুলী—এমনি সুরে কথা বলেন অনেকে ; সব সমস্যার সমাধান এবং সব প্রশ্নের জবাব নিয়ে তাঁরা তৈরি। আমাদের কবিতাভবন, পৃ. ৩১

এই সময়টাকে বুদ্ধদেব দেখেন কবিতা ও সাহিত্যের এক দুর্যোগের কাল হিসেবে ; এসময় থেকেই 'সাংবাদিকতায় সমাচ্ছন্ন' একধরণের আশাবাদী সাহিত্য ব্যাধির মতো বিস্তৃত হয়। 'বন্ধুতায় ফাটল ধরল অনিবার্যভাবে' বুদ্ধদেবের সঙ্গে অন্য লেখকদের ; 'ঘটলো একের পর এক বিচ্ছেদ—মন্থর ও মৃদু, আর কখনো বা রূঢ়ভাবে, অকস্মাৎ' ; ডাকযোগে প্রশ্ন পাঠিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ 'আপনি যে এখন বেঁচে আছেন তার কী প্রমাণ দিতে পারেন?'

এভাবেই তাঁর বিদ্ধে শত্রুতার সূত্রপাত ; যার পেছনে নিচতা, ইতরতা, অকৃতজ্ঞতা ও সাহিত্যিক ঈর্ষা সবই বিদ্যমান। এ পর্যায়ে কেউ কেউ তাঁকে রবীন্দ্র-বিরোধী হিসেবে দাঁড় করিয়ে কৃতকার্য হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও বুদ্ধদেবের সৃষ্টিশীলতায় কখনো ভাটা পড়েনি ; তাঁর আধুনিক সাহিত্যবোধ ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রত্যয় অবিচলিত ছিল। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার পর্বে বুদ্ধদেবের এই সাহিত্যিক অবস্থানের মধ্যে যে একটা বিপ্লব আছে (হার্বার্ট মার্কুস-ব্যবহৃত অর্থে), একটা রাজনীতি আছে (কালচারাল স্টাডিজের সমালোচকেরা শব্দটা যেভাবে ব্যবহার করেন) তা আজকের দিনে অন্তত আমাদের বুঝতে পারার কথা। আর তথাকথিত 'কমিটমেন্টের' কথা যদি ওঠে, তাহলে বলতে হয় বুদ্ধদেবের মতো কমিটেড লেখক বাংলা সাহিত্যে এক রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আর দ্বিতীয়টি আছে বলে তো মনে হয় না। সাহিত্যে এই কমিটমেন্টর জন্যে বুদ্ধদেব বসুর জীবনে কী পরিমাণ ভোগান্তি হয়েছিল আমাদের কবিতাভবন বইটির শেষে মুদ্রিত কবির কন্যা দময়ন্তী বসু সিংহ-এর 'সংযোজন'-অংশটি পড়লেও বোঝা যায়।

বুদ্ধদেবের আমার যৌবন শীর্ষক বই থেকে আমরা জানি যে ঢাকা ঝিবিদ্যালয়ের অবিস্মরণীয় কৃতী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও, কলকাতায় অধ্যাপনার একটা কাজ জোটাতে তাঁর প্রাণান্ত হয়। ইন্টারভিউর পর ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নিয়ে

াগকর্তাদের সংশয় ঃ মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আসা যুবক ইংরেজি সাহিত্য পড়াতে পারবে তো! ইন্টারভিউতে বুদ্ধদেবকে যখন জিজ্ঞাসা করা হতো 'কী করেন' এবং তার উত্তরে বুদ্ধদেব বলতেন 'লেখালেখি', তখন কর্তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অভিন্ন ঃ 'তাঁর মানে বেকার?' এইভাবে দিনের পর দিন চেষ্টার পর তিনি রিপন কলেজে কাজ পান, কিন্তু সা হিত্যদরদী রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের মৃত্যুর পর নতুন কর্তৃপক্ষ তাঁকে দিনাজপুরে পাঠানোর পাঁয়তারা করলে বুদ্ধদেব নিজেই সেই চাকরি ছেড়ে দেন (আজকের কথা জানি না, সেকালের বেসরকারি কলেজগুলোত অধ্যাপকদের অসম্মান ও আর্থিক দুর্গতির যে বিবরণ এমনকী জীবনানন্দের মতো অতীব নির্জনস্বভাবের কবিও প্রকাশ করে গেছেন তাঁর 'শিক্ষা-দীক্ষ া-শিক্ষকতা' (মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩৫৫) নামের একটি গদ্যে, তা থেকে বোঝা যায় রিপন কলেজের ওই চাকরি থ াকা না থাকা বুদ্ধদেবের জন্যে প্রায় সমান ছিল)। বুদ্ধদেবের অর্থকষ্ট কোনোদিনই অবশ্য যায়নি—হুমায়ুন কবির তাঁকে ছ'মাসের একটা ইউনেস্কোর প্রজেক্ট ধরিয়ে দেন একবার (দময়ন্তী), এবং তারপর থেকেই মূলত বুদ্ধদেবের বিদেশ ভ্রমণের সূত্রপাত। ১৯৫৬ সালে বুদ্ধদেব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব পেয়েই বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে এই প্রথম এ-ধরনের একটা বিভাগ নিজ হাতে গড়বার সুযোগ পান। নরেশ গুহ, অণকুমার সরকার, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়—এঁরা সবাই বুদ্ধদেবের হাতে গড়া কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। এই সময়ে বুদ্ধদেব বসু ইউরোপ-আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও স াংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ভ্রমণ, শিক্ষকতা ও বক্তৃতার আমন্ত্রণ লাভ করেন।

বুদ্ধদেব বসুর বিদ্ধে ঈর্ষাকাতর ছদ্মবেশী ভদ্রলোকদের আসল শত্রুতা শু হয় এ সময় থেকেই। বুদ্ধদেব বসু যাতে বিদেশে ন া যেতে পারেন, সেজন্যে চতুর, ধূর্তদের প্ররোচনায় তাঁর ছুটির আবেদন মঞ্জুর না করে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। ওদিকে অমৃতবাজার ও যুগান্তর গোষ্ঠি তাঁর বক্তৃতার বিদ্ধে দিনের পর দিন কুৎসা রটাতে থাকে এই বলে যে বিদেশে ঘুরে ঘুরে রবীন্দ্রনাথের বিদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে রোজগারের অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেছেন বুদ্ধদেব বসু। যাদবপুরের চাকরিতে বুদ্ধদেবকে কেন ইস্তফা দিতে হয়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দময়ন্তীর লেখায় পাই। দময়ন্তী তখন ইণ্ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটিতে পড় ালেখা করছেন এবং তাঁর বিভাগীয় প্রধান ডক্টর ফ্রেনজ বুদ্ধদেব বসুকে একটা সেমিস্টার পড়ানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জেনে অত্যন্ত খুশি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ত্রিগুণা সেন বিষয়টা শু থেকেই জানতেন এবং তাঁর সম্মতিক্রমেই বুদ্ধদেব বসু ইণ্ডিয়ানার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সবকিছু ঠিকঠাক হবার পর বুদ্ধদেব যখন নিয়মমতো ছুটির দরখাস্ত দেন, কর্তৃপক্ষ ছুটি দিতে রাজি হলেন না। আত্মসম্মান রক্ষার্থে বুদ্ধদেব বসু পদত্যাগ করেন। ছুটি না-মঞ্জুরের ছুতোয় বুদ্ধদেবকে 'বিতাড়নই' ছিল চক্রান্তকারীদের লক্ষ্য এবং তাতে তারা সফল হয়। ইণ্ডিয়ানায় এসে (১৯৬৩) শিক্ষকতা করে যাওয়ার পর (ব্লুমিংটনে আমাদের প্রতিবেশী কলকাতার এক ভদ্রমহিলা অর্চনাদির কাছে শুনেছি, ইণ্ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটির প্রধান লাইব্রেরিতে যে রবীন্দ্ররচনাবলী আছে, তা বুদ্ধদেব বসুরই উপহারগ্ন। কলকাতায় ফিরে চাকরিহীন বুদ্ধদেব সেই তঁ ার আগের লেখালেখির জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন। ভিতরে কোথায় তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল খুব। কিছুদিন পরে, ১৯৬৫ সালে, প্রায় তিন দশকের স্মৃতি বিজড়িত তাঁর অসম্ভব ভালোবাসার দু'শো দুই রাসবিহারী অ্যাভিনিউর কবিতাভবন ছেড়ে দিয়ে যেতে হয় স্ত্রী প্রতিভা বসুর সদ্য তোলা নাকতলার বাড়িতে। কবিতা অবশ্য বন্ধ করে দেন তার আগেই, ১৯৬১-তে ক াগজের পঁচিশ বছর পূর্ণ হবার পর (১৯৩৫-১৯৬১)। নাকতলার বাড়িতে এসে নিমগ্ন হন মহাভারত-চর্চায় ; এবং একের পর এক লিখে চলেন কাব্যনাট্য, মহাভারতের কথা, স্মৃতি। বন্ধুবান্ধবদের আসাযাওয়া নাকতলার বাড়িতেও অব্যাহত, কিন্তু নাকতলা কোনোভাবেই আর কবিতাভবন হয়ে ওঠেনি। কবিতা পত্রিকা নেই, কবিতাভবন নেই, কিন্তু বুদ্ধদেবের গদ্যের একটা অসাধারণ উৎকর্ষ ও পরিণতি তাঁর শেষ বয়সের লেখায় পেয়ে গিয়ে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করি। বুদ্ধদেবের সাহিত্য ও শিল্পবোধের চরমোৎকর্ষ তাঁর এ পর্যায়ের কাজে দ্রষ্টব্য। তাঁর কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬), তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬), অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ (১৯৭০), স্বাগতবিদায় ও অন্যান্য কবিতা (১৯৭১) ও মহাভারতের কথা (১৯৭৪) এ-সময়কার শস্য। এ-সময়কার ঘটনা বুদ্ধদেব বসু তাঁর অসম্পূর্ণ লেখায় লিখে যেতে পারেন নি। বুদ্ধদেব বসু কবিতা ও কবিতাভবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস যে লিখে যেতে পারলেন না সেজন্যে দুঃখবোধ আমাদের থেকে যাবেই।

হ্যারিয়েট মনরো-র পোয়েট্রি (১৯১২) ও বুদ্ধদেবের কবিতা (১৯৩৫) পত্রিকার যাত্রা শু হয় কিন্তু একইভাবে। চাঁদা তুলে কেবলই কবিতা নিয়ে কাগজ বার করার সিদ্ধান্ত নেন একে অপরের অপরিচিত, আটলান্টিকের দুই পারের দুই

কবি। একজন নারী, অন্যজন পুষ। দু'জনেই আধুনিকতার পক্ষালম্বনকারী, দু'জনের উদ্যোগই অ-প্রাতিষ্ঠানিক। যখন শু করেন কাগজ দু'জনের কেউ-ই তখনো খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা পান নি। তবে আধুনিক কবিতা লিখলেও, কাগজ বের করে অ াধুনিক কবিতার জন্যে সংগ্রাম বা আধুনিক কবিদের প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে বুদ্ধদেবের মতো তীব্র ও একটানা কোনো লড় াইয়ে লিপ্ত হতে হয়নি মনরোকে। কিংবা লড়াই হয়তো করেছিলেন তিনি—বিদেশে, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে, অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর পর যার ইতিহাস অনেকে জেনেও হয়তো লেখেন নি। প্রসঙ্গটা ইসমায়েল রীড এক সাক্ষাৎকারে তুলেছিলেন ক'বছর আগে। রীড বিশ্বাস করেন আধুনিক কবিতার আন্দোলনে মনরো ও আরো দু'একজন নারীর যে ভূমিকা ছিল তাকে গৌণ করে দেখে এজরা পাউণ্ডের মতো পুষ কবি কর্মীদেরকেই বড় করে তোলা হয়েছে। রীডের কথা ভাবনার উদ্রেক করে এজন্যে যে এদেশের নারীরা পুষদের মতো জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান স্বাধীনতা ভোগ করলেও নারীর প্রতি এখানকার বেশিরভাগ পুষদের যে কোনো শ্রদ্ধা নেই তা আমার অভিজ্ঞতা থেকেই তো জানি।

'পপুলার ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রে কবিতার নামে প্রতিদিন রাজ্যের যে রাবিশ অনবরত মুদ্রিত হতে দেখি, তার বিপরীতে ভালো কবিতা নিয়ে একখানা সুন্দর কাগজ করার ইচ্ছে থেকেই পোয়েট্রি-র জন্ম', আত্মজীবনীতে লিখেছেন মনরে া[Harriet Monroe, A Poet's Life : Seventy Years in a Changing World (New York : Macmillan, 1938), p. 256৵। তবে কবিতার পাশাপাশি উৎকৃষ্ট গদ্য ছাপবার প্ল্যানও ছিল তাঁর। বুদ্ধদেবের কবিতা-ও এর ব্যতিক্রম নয়—কবিতা-য় বুদ্ধদেবকে যেরকম অনেককিছু একহাতে লিখতে হত, মনরোকে ওরকম কোনো ঝামেলা পোহাতে হয়নি। এটা অবশ্য কেবল ঝামেলার প্রশ্ন নয় (ঝামেলা তো ছিলই— সম্পাদকীয় থেকে শু করে, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাড়াও গ্রন্থের প্রা প্তিস্বীকার, নোটিশ, বইয়ের বিজ্ঞাপন— নিজের এবং অন্যের— সবই তো তিনি প্রায় এককভাবে করতেন ; তার উপর ছিল কাগজ এবং ছাপাখানার পয়সা যোগানোর দুশ্চিন্তা। মনে রাখতে হবে যে আমরা এমন একটা সময়ের কথা বলছি— অবশ্য সময় যে খুব বদলেছে তা-ও নয়—যখন রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রশংসা না করায় ঝিভ ারতী কবিতা-য় বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দেয়), কবিতা তো বটেই তার পাশাপাশি আধুনিক গদ্যের প্রতিষ্ঠাদানও ছিল বুদ্ধদেবের প্রজেক্ট— যা তিনি প্রায় এককপ্রয়াসে অফুরন্ত ভাবে, অসাধারণ প্রতিভাবলে সম্পন্ন করেন। অর্থসংকট পে ায়েট্রি-রও ছিল ; কিন্তু মনরো-কে বুদ্ধদেবের মতো সহস্র দুশ্চিন্তা আর গাঁটের পয়সা খরচ করে, লেখালেখি দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, সাহিত্যপত্রিকা বের করতে হয়নি। পোয়েট্রি-তে যাঁরা কাজ করেছেন, বলা বাহুল্য, তাঁদের কেউ-ই সাহিত্যের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন না ; সবাই মাইনে নিয়েই সাহিত্যসেবা করতেন।

পোয়েট্রি-র মটো ছিল, 'মহৎ কবির জন্যে মহৎ পাঠক সৃষ্টি' (হুইটম্যান)—এবং পোয়েট্রি-র লক্ষ্য ছিল সে-ধরনের সংবেদনশীল এক পাঠকগোষ্ঠির উদ্ভাবন। কিন্তু কেবল নতুন কবিদের প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করা নয়, মনরো সমকালের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের উৎকৃষ্ট লেখা ছাপানোর জন্যেও সমান উৎসাহী ছিলেন। অর্থাৎ পোয়েট্রি-কে কেবল আধুনিক কবিত ার মুখপত্র করে তোলা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। বুদ্ধদেবও প্রবীণদের লেখা ছেপেছেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল আধুনিক কবিতা (অর্থাৎ শুধু বিশেষ ধরনের বা ফর্মের কবিতা নয়, তার পেছনে যে বিশেষরকমের একটা বোধ ও তত্ত্ব আছে তা-ও) ; এবং কবিতা সর্বার্থে তাই ছিল।

যেমন শুতে, তেমনি এখনো, পোয়েট্রি-র পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে এগিয়ে আসেন অনেকেই। বিভিন্ন ব্যক্তির অনুদানের ওপর নির্ভর করেই পোয়েট্রি-র প্রতিষ্ঠা। এটা অবশ্য আমেরিকার ইতিহাসে মোটেও নতুন নয়। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, আমেরিকার শিক্ষা-সংস্কৃতির সকল উদ্যমের পৃষ্ঠপোষণায় সরকার নয়, আছে বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান ; যা রিপ াবলিকের সূচনালগ্ন থেকেই ব্যতিক্রমহীনভাবে সত্য। সরকারের ভূমিকা এর কোনোটাতেই প্রায় নেই বললেই চলে। এদেশের সকল বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ব্যক্তির অনুদানের ওপর নির্ভরশীল— সরকার থেকে যা আসে, বলা যায় উপহার হিসেবে, তা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাকুক, একটা বিভাগের ছ'মাসের ব্যয়নির্বাহও অসম্ভব। পোয়েট্রি-র বর্তমান সম্পাদক যাকে বলছেন 'প্রাইভেট ফিলানথ্রপি'(Joseph Parisi, "The Care and Funding of Pegasus," The Little Magazine in America : A Modern Documentary History, ed. Elliott Anderson and Mary Kinzie (Yonkers, N. Y. : Pushcart Press, 1978), p. 218], কাগজটির এতকাল ধরে টিকে থাকার রহস্য সেই ব্যক্তিগত অনুদানই। পোয়েট্রি-তে এমনকি গোড়ার দিকেও যাঁরা লিখেছেন, তাঁরাও পারিশ্রমিক পেয়েছেন। বিনা পারিশ্র মিকে কাউকে কিছু লিখতে হয়নি। এ নিয়ে মনরোর বেশ গর্বও ছিল—এক জায়গায় লিখেছেন, আমরা যে কবিদের

উপযুক্ত সম্মানী দিই এবং সেদিক থেকে আমাদের কবিতার কাগজ যে একেবারেই ব্যতিক্রম তা অনেকে উল্লেখ করতে ভুলে যান দেখে অবাক হই।

পোয়েট্রি-র সুদীর্ঘ জীবনে সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদক হিশেবে এসেছেন অনেকেই যাঁদের কেউ কেউ লেখক হিশেবে এবং অন্তত একজন কবি হিসাবে—যেমন কার্ল শাপিরো— উল্লেখযোগ্য। ১৯১২-র অক্টোবরে প্রথম সংখ্যা (কবিতা-র প্রথম সংখ্যাও বেরোয় অক্টোবর মাসে, ১৯৩৫ সালে ; সেদিনই বুদ্ধদেব বসু-র প্রথম কন্যা মীনাক্ষীর জন্ম হয়) বার হবার পর এজরা পাউণ্ড (প্রথম সংখ্যাতেই যাঁর 'টু হুইস্‌লার'—অ্যামেরিকান কবিতাটি ছাপা হয় ও বিতর্ক তোলে) ইংল্যাণ্ড থেকে চিঠি লিখে জানান যে ইউরোপ থেকে তিনি লেখাজোখা সংগ্রহ করে দিতে পারবেন। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে তিনি পোয়েট্রি-র 'বিদেশ প্রতিনিধি' নিযুক্ত হন। পাউণ্ড অবিলম্বে ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথের লেখা সংগ্রহ করে পাঠান। প্রথম বছরের (১৯১২) তৃতীয় সংখ্যাতেই ইয়েট্‌সের কয়েকটি লিরিকের সঙ্গে বেরোয় রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ছ'টি কবিতা। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলে, আনন্দিত মনরো লেখেন ঃ

It seemed too good to be true that our little magazine had officially 'discovered'—at least in English—this Asian poet whose name was now resounding throughout the world. (A Poet's Life, p. 332.)

পোয়েট্রি যখন প্রতিষ্ঠালাভ করল, পাউণ্ড উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন এবং জড়িত হয়ে গেলেন অন্য একটি সাহিত্যিক াগজ—লিটল রিভিয়্যু-র—সঙ্গে। তবু, যেমন মনরো লিখে গেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে, পাউণ্ড পোয়েট্রি-তে কবিতা পাঠ ানো বন্ধ করেননি ; কবিতার বাইরেও অন্য লেখাজোখা দিয়ে গেছেন নিয়মিত (যেমন পোয়েট্রি-তে প্রকাশিত কোনো লেখা বিষয়ে তাঁর অভিমত বা প্রতিক্রিয়া—কখনো বা কোনো বইয়ের রিভিয়্যু)।

শুর দিককার অর্থাভাব ও অন্যান্য সংকটের একটা কিনারা হয়ে এলে পর হ্যারিয়েট মনরো বিদেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পাউণ্ডের সঙ্গে দেখা করার পর (১৯২৩) তাঁর বিশ্বপর্যটনের সূচনা। মনরোর ভ্রমণের প্রভাব পোয়েট্রি-তেও পড়ে— কাগজটি হয়ে ওঠে সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক। উদাহরণ হিশেবে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর চীন ভ্রমণের কথা। চীন ভ্রমণের পর পোয়েট্রি-র বিশেষ চীন সংখ্যা (এপ্রিল ১৯৩৫) প্রকাশিত হয় যার মধ্যে শুধু ধ্রুপদী চীনা কবিতা নয়, ওখানকার সমকালীন নতুন ও উদীয়মান কবিরাও উত্থাপিত হবার সুযোগ লাভ করেন। হ্যারিয়েটের অনুপস্থিতিতে পোয়েট্রি-র চরিত্রে কিছুটা পরিবর্তন আসে— কারো কারো মতে কিছুকালের জন্যে এর সাহিত্যমানের নিম্নগামিতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ওদিকে পের ইনকায় বেড়ানোর সময় হার্ট অ্যাটাকে হ্যারিয়েট মারা যান। পোয়েট্রি-র উত্তরকালের ইতিহাসে আমরা সম্পাদকের পর সম্পাদক বদল হতে দেখি। হ্যারিয়েটের মতো নিরাসক্ত নিরপেক্ষতা—যা অনেকসময়ে তণ কবিদের বিরক্তির উদ্রেক করত—আর দেখা যায় না। যাঁরা সম্পাদক হিশেবে পরবর্তীতে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের কোনো না কোনো একটা মত ছিল, পক্ষপাত ছিল, এবং তার প্রতিফলন তাঁদের সম্পাদিত পোয়েট্রি-তে অলক্ষণীয় থ াকেনি। মনরোর পরে যাঁরা পোয়েট্রি-র সম্পাদক হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করতে পারি—মর্টন যাবেল, জর্জ ডিলন, কার্ল শাপিরো, হেনরি র‍্যাগো, ডেরিল হাইন ও ডেসেফ প্যারিসি। বলা বাহুল্য, এদের মধ্যে কার্ল শাপিরো সবচেয়ে খ্যাতিমান। শাপিরো সম্পাদক হন সে বছরেই যখন টি এস এলিয়ট ঘোষণা করেন যে "পোয়েট্রি আজ আর কেবলমাত্র একটি লিটল ম্যাগাজিন নয়, একটি প্রতিষ্ঠান।" কবি হওয়ার কারণে শাপিরো কাগজটিকে ঢেলে সাজাতে উদ্যো াগী হন। পোয়েট্রি-র দরজা সেসব লেখকদের জন্যে উন্মুক্ত থাকা বাঞ্ছিত যাদের অবস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এবং গোঁড় া প্রবীণেরা যাদের লেখায় অসন্তুষ্ট ঃ এই ছিল তাঁর মত। আমার ধারণা, সূচনাকালীন পোয়েট্রি দিয়ে নয়, বুদ্ধদেবের কবিতা পত্রিকা সম্ভবত এসময়কার পোয়েট্রি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বেশি (মীনাক্ষী দত্ত কবিতা-র যে তিনটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করেন, তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে চোখ বুলালেও তা আমাদের চোখে পড়বে)। পঞ্চাশ দশকে কার্ল শা পিরো-সম্পাদিত পোয়েট্রি-র একটা নতুনত্ব ছিল। এ সময়ে পোয়েট্রি-তে প্রকাশিত হন অডেন, জন বেরিম্যান, রবিনসন জেফার্স, পল গুডম্যান, ওয়ালেস স্টিভেন্সের মত কবিরা। কার্ল শাপিরোর সম্পাদনাকাল অনেক ধরনের বিতর্কের জনয়িতা। একবার তিনি উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামসকে, কার্ল স্যাণ্ডবার্গ সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব দেন ; স্যাণ্ডবার্গ ছিলেন শাপিরোর প্রিয় কবি এবং তাঁর ধারণা ছিল, ইউলিয়ামসও অনুকূলেই লিখবেন। স্যাণ্ডবার্গ বিষয়ে উইলিয়ামসের মত ছিল একেবারেই বিপরীত এবং লেখাটি যখন পোয়েট্রি-তে বেরলো, স্যাণ্ডবার্গ এতোই ক্ষিপ্ত হন যে শা

পিরোর সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কনরাড এইকেনও ছিলেন শাপিরোর বন্ধু, কিন্তু তাঁর আত্মজীবনীর বির প সমালোচনা পোয়েট্রি-তে বার হবার পর সে সম্পর্ক চুকে যায়। কনরাড এইকেন অবশ্য পোয়েট্রি-র বিদ্ধে মামলা কর ার উদ্যোগ নেন, তার কারণ রিভিয়্যুকার ইচ্ছাকৃতভাবে বইয়ের অনেক উদ্ধৃতি বিকৃত করেছিলেন। পোয়েট্রি সেসব উদ্ধৃতি সঠিকভাবে ছাপতে রাজি হলে, কনরাড এইকেন আর মামলা করেননি। সাহিত্যের ইতিহাসে এসব অবশ্য নতুন ঘটনা নয়। কার্ল শাপিরো ঝুঁকি গ্রহণে উৎসাহী ছিলেন, এক সাক্ষাৎকারে তাঁর পোয়েট্রি সম্পাদনার ইতিহাস বলতে গিয়ে, তিনি বলেন ঃ 'আমি কখনো কখনো এমন কবিদের বিশেষভাবে জায়গা দিয়েছি, যারা উত্তরকালে বিখ্যাত—যেমন ফ্রাঙ্ক ও'হারা ও টমলিনসন ; কখনো আবার ছেপেছি অনেকের লেখা প্রথমবারের মতো, অর্থাৎ পোয়েট্রি-তেই যারা প্রথম প্রকাশিত—কারো কারো ক্ষেত্রে সেটাই প্রথম ও শেষ লেখা।' এদিক থেকে বুদ্ধদেবের অভিজ্ঞতাও খুব ভিন্ন নয়। কবিত াভবনেই বুদ্ধদেব লিখেছেন যে তিনি এমন কারো কারো লেখাও ছেপেছেন, যাঁদেরকে ভুলবশত তাঁর খুব সম্ভাবনাময় মনে হয়েছিল যেমন সুরেশচন্দ্র সরকার, মুকুল ভট্টাচার্য কিংবা ছদ্মনামে সুস্মিতা সরকার, কিন্তু লেখালেখিতে পরে আর কখনো যাঁদের দেখা মেলেনি।

যেমন আগে উল্লেখ করেছি, পোয়েট্রি-র মূল উদ্দেশ্য ছিল ভালো কবিতা ছাপানো (যেমন মনরো স্পষ্ট করেই লিখেছেন, কোনো একটা বিশেষ কবিতার তত্ত্ব, স্কুল বা আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব অথবা অন্য কোনোভাবে তার মুখপত্র হয়ে ওঠা এর লক্ষ্য ছিল না)। আজকের দিনের সবচেয়ে ভালো কবিতাটি সংগ্রহ করে ছেপে দেওয়া ছিল আমাদের লক্ষ্য, আর কিছু নয়, মনরো বলেছেন। লিখেছেন, 'আমরা জানতে চাইনা কবিতার কোন তত্ত্বে তাঁর উৎসাহ, কোন্ ধরণের কবি বা কবিত ার প্রতি তাঁর পক্ষপাত, কোন্ দেশের তিনি অধিবাসী, কোথায় তিনি বিলং করেন।' মনরোর মৃত্যুর পরও সম্পাদকীয় নীতির এই উদারতা অব্যাহত থাকে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বুদ্ধদেব বসু তো বটেই, আরো অনেক বাঙালি ও ভারতীয় কবির মূলে ইংরেজিতে লেখা কবিতা বা তাঁদের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পোয়েট্রি ছেপে দিতে দ্বিধা করেনি। এ ধরনের উদ ারতা সেই সময়ে তো বটেই, এখনো দুর্লভ।

কোনো বিশেষ কাব্যান্দোলনের প্রতিনিধি ছিল না বটে, তবু একটা সময়ে, প্রথমদিকে, ইমেজিস্টদের কৈশোরে, প্রবীণেরা পে ায়েট্রি-কে ইমেজিজমের মুখপত্রই মনে করতেন। এর কারণ এ কাগজে ইমেজিস্ট তণ কবিদের ক্রমিক উপস্থিতি (পাউণ্ড, ফ্লিন্ট, টি ই হিউম, হিলডা ডোলিটলের লেখা বেরোয় এখানে)। দ্বিতীয় বর্ষে একই সংখ্যায় (মার্চ ১৯১৩) ইমেজিজমের ওপর দু-দুটো লেখা— যার একটি আবার পাউণ্ডের নিজের— প্রকাশিত হলে অনেক প্রবীণ এ বিষয়ে নিঃসংশয় হন। কিন্তু পোয়েট্রির সংখ্যাগুলোতে চোখ বুলিয়ে গেলে এবং এর বিবর্তন লক্ষ করলে আর যাই হোক একে ওরকম র‍্যাডিকাল মনে হয়না। তাছাড়া কবিতা নির্বাচন ও প্রত্যাখানের কোনো কোনো সিদ্ধান্তে মনরো রক্ষণশীলতারও পরিচয় দেন, যেমন তিনি ই ই কামিংসের মতো কবির কবিতা ছাপতে রাজি হননি। লিটল রিভিয়্যু এজন্যেই পোয়েট্রি-কে রক্ষণশীলদের রক্ষ াকবচ হিসেবে চিহ্নিত করে। পোয়েট্রি অবশ্যই তা ছিল না, তবে শুতে নানা বোধগম্য কারণে কাগজটি যথেষ্ট বিতর্ক কুড়ে ায়—এবং তা রক্ষণশীলতার জন্যে নয়। যেমন কার্ল স্যান্ডবার্গের শিকাগো কবিতাটি যখন বেরোলো মার্চ ১৯১৪-তে রক্ষণশীলদের ডায়াল পত্রিকা এর বিদ্ধে কটূক্তি করে। অনেকে, বিশেষত বামঘেঁষা কিছু লেখক, এ বলেও সমালোচনা করেন যে পোয়েট্রি-তে যা বেরোয় তার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা অকিঞ্চিৎকর। রক্ষণশীল নয়, পোয়েট্রি ছিল আধুনিকদেরই কাগজ, যা প্রবীণ রক্ষণশীলেরা শু থেকেই নির্ভুল আঁচ করতে পেরেছিলেন। ১৯১৫ সালের জুন মাসে টি এস এলিয়টের বিখ্যাত কবিতা 'দি লাভ সং অফ আলফ্রেড প্রুফ্রক' পোয়েট্রি-তেই বেরোয়, রক্ষণশীলেরা যার তুমুল সমালোচনা করে (একজন লেখেন কাব্যচর্চা কিভাবে প্যাথলজির উদাহরণ হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত এই কবিতা!)

মনরোর সাহিত্যিক মনের গড়ন বহুলাংশেই বুদ্ধদেবীয়—অর্থাৎ সাহিত্যের সামাজিক উপযোগে তিনি অবিশ্বাসী না হলেও গভীর সংশয়ী ছিলেন। কবিতা গ্রহণ বা বর্জনকেই তিনি একমাত্র দায়িত্ব মনে করতেন না, সম্পাদক হিসাবে তিনি চিঠি লিখে নিজের মতামত অনুপুঙ্খভাবে জানাতেন। এদিক দিয়েও বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর গভীর মিল লক্ষ করার মত। সবচেয়ে বড় মিল বোধ হয় দু'জনের মনের ঔদার্যে, মুক্ততায় ; পরিগ্রহণের বিরল ও অকুণ্ঠ ঔৎসুক্যে ; সাহিত্যের জন্যে দরদ ও সংস্কারমুক্ত ভালোবাসায়। একারণে ইমেজিস্টরা যেমন, তেমনি বামপন্থী কবিরাও এতে জায়গা পেয়েছিলেন ; ১৯৩৬ স ালে বেরোয় বাম সাহিত্যসংখ্যা ; ১৯৩২ সালে অ্যালেন টেট অতিথি সম্পাদক হয়ে সাদার্ন লিটারেচারের জন্যে

বিশেষসংখ্যা বার করার সুযোগ পান। এছাড়া 'বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র জন্যে মনরো পুরস্কারেরও প্রবর্তন করেন। আরো নানাধরনের পুরস্কারও প্রবর্তিত হয় পোয়েট্রি-র উদ্যোগে—এবং তা দেখেশুনে আমেরিকার বিক্ষুব্ধ সজনীকান্ত দাশেরা বললেন, 'টাকা পয়সা দিয়ে কবিতাকে কমার্শিয়াল করবার পাঁয়তারা ছাড়া এসবের আর কী মানে হতে পারে!'

রাজনীতিতে অনুৎসাহী হলেও, দ্বিতীয় ঝিযুদ্ধের সময় পোয়েট্রি-র পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব ছিল না—যুদ্ধ নিয়ে ওয়ালেস স্টিভেন্সের একগুচ্ছ কবিতা ছাড়াও আরো তিনজন কবির যুদ্ধবিষয়ক কবিতা ছাপা হয় ; জয়েস কিল্‌মের, আইজাক রোজেনবার্গ ও পার্ট ব্রুক— তিনজনেই যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান। কবিতা বেনোর পর ব্রুকের ঠিকানায় সম্মানীর চেক পাঠালে তা ফেরত আসে 'প্রাপক মৃত' বলে। বুদ্ধদেবের বিদ্ধে অনেকের অভিযোগ ছিল যুদ্ধ ও সমকাল বিষয়ে তাঁর নিরাসক্তি। দ্বিতীয় ঝিযুদ্ধ অবশ্যই এক বড় ঘটনা, কিন্তু আমাদের জীবন ও ইতিহাসে এর এমন কোনো বড় প্রাসঙ্গিকতা নেই। একটা উদাহরণ দিই। পোয়েট্রি-তে লিখেছেন এরকম প্রায় বত্রিশজন কবি যুদ্ধে যান—দ্বিতীয় ঝিযুদ্ধে কোনো বাঙালি কবিকে কি যুদ্ধে যেতে হয়েছে? হাঁ যুদ্ধের প্রভাব তবু পড়েছিল বাংলায় এবং বুদ্ধদেব যে সে বিষয়ে অন্ধ ছিলেন না খোদ কবিতাভবনেই তার সাক্ষ্য আছে ঃ

হঠাৎ একদিন শহর ছেয়ে গেল লাল আর খাকি কোর্তায় ; তারা আমাদের রক্ষক এবং তাদেরই দাবি সর্বাগ্রগণ্য ; লেক থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত সর্বত্র তারা সঞ্চারমান, কোন্ দূর রানী-কুঠি না বাঁশধানির জঙ্গলেও তাদের ছাউনি পড়েছে... দোকানে সিনেমায় গিশগিশ করছে খাকি ... তারপর যুদ্ধ যখন ঘন, আমাদের সামাজিক বৃত্তে প্রবিষ্ট হতে লাগল একটি দু'টি করে সামরিক পুষ। আমরা দেখলাম তারা সকলেই ছুটির ঘণ্টায় মদ আর মেয়েমানুষে ভরে থাকে না। আমাদের পূর্বপরিচিত টমি জাতীয় জীব নয় তারা ; অনেক আছে ভদ্র যুবা, তাদের মধ্যে আছে শিক্ষিত ছেলে, বইয়ের পড়ুয়া, শিল্পরসিক ... যামিনী রায়ের স্টুডিও তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে তাদের। খেয়ালের ধ্রুপদের আসরে তাদের দেখা যায়, বাংলাভাষার কবিদের বিষয়ে তারা উৎসুক ... এমনি করে যুদ্ধের ধাক্কায় ধবসে পড়েছিল শাদা এবং কালোর মধ্যে জাতিভেদ, যা গড়ে তুলেছিল এই ছেলেদেরই সাম্রাজ্যদক্ষ পূর্বপুষেরা ভারতবর্ষে ... সুধীন্দ্র দত্তর বন্ধুমহলে পর-পর কয়েকটা বিয়ে হয়ে গেলো যার পাত্র ইংরেজ ও পাত্রী বাঙালি— জব চার্ণকের আমলের পরে বোধ সেই প্রথম।

যুদ্ধের আরো অনেক গল্প বলেছেন বুদ্ধদেব—তাঁর অবলোকন অব্যর্থ ; দু'তিন পৃষ্ঠায় ছবির মতো উঠে এসেছে যুদ্ধ-সমকালীন কলকাতা। লিখেছেন কীভাবে এসময়ে তৈরি হতে থাকল কবিতার নতুন নতুন পাঠক ; বিক্রি হয়ে গেল কবিতাভবনের পুরনো, বহুদিন পড়ে থাকা বই ও পত্রিকা ; বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে বাংলার তৈরি হল নতুন ধরনের একটা সম্পর্ক। 'যেন কিঞ্চিৎ সচ্ছলতার স্বাদ পাচ্ছি আমিও, আমার ছাত্রজীবন ফুরোবার পর সেই প্রথম'— লিখেছেন বুদ্ধদেব। লক্ষ করব যুদ্ধের সমর্থন-অসমর্থনের অবান্তর তর্ক (ফ্যাশিজমের বিরোধিতা করে লেখা বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত স্পেনের গৃহযুদ্ধ ঃ পঞ্চাশ বছর পরে বইতে আছেগ্ন। বুদ্ধদেবের পর্যবেক্ষণের গুত্ব এর তীক্ষ্ণতায়, তির্যকতায়, বাস্তবধর্মী স্বাভাবিকত্বে। আগে থেকে ঠিক করা কোনো মতাদর্শে দীক্ষিত না হওয়ার ফলেই তাঁর পক্ষে যুদ্ধের বহিরবয়বের অন্তরালে অন্যধরনের একটা সত্য, অন্যধরনের একটা বাস্তবতার অনুধাবন সম্ভবপর হয়েছিল। 'যুদ্ধ খারাপ', 'যুদ্ধ সর্বনেশে'—এইসব ভাবালুতার মধ্যে না গিয়ে, মানবজাতির সংঘাত অন্য কোনো সম্ভবপরতার পরিসর তৈরি করে কিনা তা-ই হয়তো দেখবার ও বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। প্রকৃতিকে অতিত্রম করে নানাভাবে সংস্কৃতির ডাঙায় অবতীর্ণ হয় মানুষ—তার সবই আমাদের বাঞ্ছিত নয় ; অকাম্য হলেও যুদ্ধের ভেতর দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে আমাদের, এবং হয়ত-বা নিজেদের অজান্তেই সংস্কৃতির নতুন কোনো বৃত্ত, নবতর কোনো মানচিত্রের উত্থান সম্ভবপর হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেবের লেখা যাঁরা যত্ন করে পড়েছেন, আমার এই ভাষ্য তাঁদের কাছে খুব বেগানা ঠেকবে না।

আধুনিক কবিতার আন্দোলন কিংবা তার বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠা বা প্রতিনিধিত্ব বুদ্ধদেবের মতো মনরোর লক্ষ্য ছিল না বটে, তবু পোয়েট্রি-র সার্থকতা কি শেষ পর্যন্ত তা-ই নয়? কিন্তু আগে যেমন বলেছি, পোয়েট্রি কেবল মনরোর একার কাজ নয়—এ আসলে বহুজনের মিলিত উদ্যম ও প্রয়াস। মনরোর মৃত্যুর পর সম্পাদকের পর সম্পাদক বদল হবার সূত্রে এর চরিত্রও বদলায় বিভিন্ন সময়ে। হ্যারিয়েট মনরোকে ভাবীকাল খুব সম্ভবত পোয়েট্রি-র প্রতিষ্ঠাতা হিশেবেই মনে রাখবে ; কবিতা, সাহিত্যচর্চা কিংবা আত্মজীবনীর জন্যে নয়। কিন্তু বুদ্ধদেব আমাদের স্মরণীয় শুধু সম্পাদনার কারণে নয়, তাঁর বিপুল বিচিত্র সাহিত্যকর্মের জন্যে। কবিতা ও কবিতাভবনের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব হয়ে ওঠেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের

অপ্রতিরোধ্য অভিভাবক। কবিতা ও কবিতাভবন বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব সৃষ্টি ঃ তাঁর হাতে পত্রিকা সম্পাদনা কেবল একটা দ ায়িত্ব বা সামাজিক কর্ম থাকেনি, হয়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতায় একজন মহৎ শিল্পীর নিবিড়, তুমুল, মগ্ন, অপরূপ সৃজনউদ্যমের উদ্ভাবনাময় আখ্যান।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com